"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৫ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৫৯ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১১ই ফাল্গুন, ১৪৩১ / 24.02.2025

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
চিঠিপত্র	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
নিদ্রা এবং বেদনা	শ্রীমা
গীতাপাঠের প্রয়োজনীয়তা	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ
উৎস সন্ধানে	শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার
মন চলে হিমাচলে	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
আজকের কাব্য	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158 / 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

DO NOT COPY

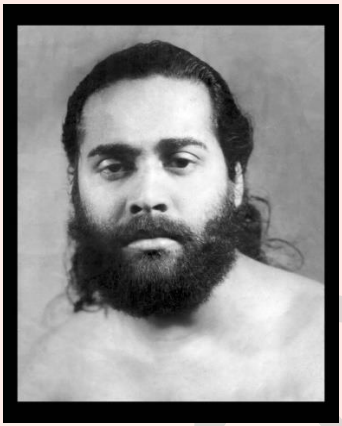

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"আমি আজ সমস্ত অতীতকে ভুলে যেতে চাইছি। শুধু ততটুকু থাক আমার সাথে যা ভবিষ্যত জীবনকে গড়বার পক্ষে সহায়তা করবে। সমস্ত অতীতই আমার জীবনে মধুময় ও প্রেমময়। এই অতীতই আজ আমাকে এখানে ও বর্তমান জীবনে পৌঁছে দিয়েছে। অতীত হয়তো কোথাও নিষ্ঠুর হয়েছে, কিন্তু সে দিয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান ও বিপুল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য। যেখানে হৃদয়ের তিক্ততা পেয়েছি, তারই মাঝে এসেছে শাশ্বত স্পন্দন। যেখানে কঠোর বেদনা ঠিক সেইখানেই পেয়েছি করুণাময়ীর অপার স্নেহ। সকলে হয়তো ছেড়েছে আমাকে, - ছাড়েনি মা, ছাড়েনি রাধা। স্নেহ মমতার শক্তি বল, প্রেম ভালবাসার গভীর বন্ধন, - সব কিছুই শাশ্বত।"**

** (শ্রীপ্রীতিকুমারের ব্যক্তিগত দিনলিপি ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৬ থেকে গৃহীত)

DO NOT COPY

চিঠিপত্র **শুক্লা ঘোষ**

অনেক দিন পর শ্রীপ্রীতিকুমারের চিঠির ঝুলিটি খুললাম। সকলেই একটু শঙ্কিত হয়েছেন ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকার ধর্ম বোধহয় যায় যায়! আসলে সত্যকে পালন করাই তো ধর্ম। ধর্ম তো কোনও সাজানো বস্তু নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে আত্মরক্ষামূলক আচরণ করি, যার থেকে অন্যকে রক্ষা করা যায়, সেটাও তো ধর্ম। আমি সোজা মানুষ। আমার লেখনীতে ধার এসে যায় মাঝে মাঝে যখন সংসারের আশেপাশে কোনও বাসনা, স্বার্থপরতার আনাগোনা দেখি। শ্রীপ্রীতিকুমার বরাবর সংসারটা 'আমার' বলেই অভিহিত করেছেন; তাই এই সংসারকে পরিচালনা করা আমার ধর্ম বলেই মনে করি। হয়তো আমি সবাইকে সুখী করতে পারি না, সন্তুষ্ট করতে পারিনা, কিন্তু তার জন্য আমি তো অন্য কারও গণ্ডীতে প্রবেশ করছি না। সারা জীবন একটি সংসারকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলবার জন্য যে কঠোর সংগ্রাম আমি করেছি তার জন্য শেষ জীবনে আমি একটু শান্তি আশা করতে পারি। একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাইতেই পারি। যেখানে কর্তব্য পালন করবার, আমি করেইছি। তারপর যদি আরও চাহিদা থাকে বা ত্যাগ করতে হয়, বলব – হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে ...। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে স্বাধীন ভাবে থাকতে দিয়েছেন, স্বাধীন ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করে গেছেন। স্বাধীন ভাবে থাকবার আদেশ করে গেছেন। তার সাক্ষী অনেকেই আছেন। আজ সেকথা ভুলে গেলে তো চলবে না। এবার চিঠিগুলি পড়লে শ্রীপ্রীতিকুমারের মনোভাবটা বোঝা যাবে আশা করি।

০৭/০৬/৬৬

অভিন্নহৃদয়েষু,

কোনও ভয় নেই। জলে নেমে যেমন কাপড় ভেজবার ভয় করতে নেই, তেমনি ভয়শূন্য হয়ে কাজ কর। দেখবে সর্বদা ঈশ্বর তোমার সহায়তা করছেন। বিপদ ও বিঘ্নকে ভয় করতে নেই। আদের প্রেমের দ্বারা জয় করতে হয়। পাহাড় পর্বতকে ভালোবাসো, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে নিজের প্রেম মিশিয়ে ধর,

দেখবে সব বিঘ্নকে জয় করছো অতি সহজে। কোনও ভাবনা করো না। ভাবনা যা, তা আমি আর ঈশ্বর করছি। তুমি শুধু এগিয়ে চল কোনও সংশয় না রেখে। জয় নিশ্চিত জেনো। ওখানকার সব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং ভিতরের স্পন্দন যা হয়, সব লিখে রাখবে।

দু' চোখ মেলে, প্রাণ ভরে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি কর। প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাও, দেখবে অন্য এক রাজ্যের সন্ধান পাবে। অন্তরতমকে পাবে। পাবে তার স্পর্শ ও স্পন্দন।

বাবু ভালো আছে। আপন মনেই আছে। তোমার সংসার চলছে তার নিয়মে।

আদর জেনো।

ইতি –

শ্রী প্রীতিকুমার

অভিন্নহৃদয়েষু,

আজও তোমার দু'টি চিঠি পেলাম। চিঠি যেমন দেরীতে আসে তেমন দেরীতেই যায়। ভাবনা কোরো না। মা সঙ্গে আছেন। জীবনে প্রতি ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতা বেড়ে চলেছে।

সাহস রাখ। সাক্ষাৎ অনুভূতি রাখতে চেষ্টা কর যে ঈশ্বর সঙ্গে আছেন। জীবনে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়। আর জীবনে নানাভাবে নানাদিক দিয়ে তা আসে। নীরেন তোমার চিঠি পেয়েছে। ওরা খুবই খুশী। সুন্দর চিঠি হয়েছে। আমিও শুনেছি। মনে হয় শ্রীলার সাহিত্য হার মেনেছে।

বাবুকে কোথাও নিয়ে বেড়াতে যেতে পারিনি। সময় একদম পাইনি। রবিবার সিনেমা দেখাব ঠিক করেছি। তোমার সংসার কিছুটা গুছিয়ে তুলেছি। আরও গুছিয়ে তুলছি। এলে সব দেখতে পাবে।

আদর জেনো।

ইতি – শ্রী প্রীতিকুমার

DO NOT COPY

10th June, 1966

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার অনেকগুলি চিঠি আজ একসঙ্গে পেলাম। ভয় পেয়ো না। দেখবে ঁমা তোমার সঙ্গে আছেন। বিশ্বাস রাখ তিনি তোমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ভাবনা নয়। এগিয়ে চলবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প রাখ। জয় যেখানে নিশ্চিত, সেখানে ভীরুতা, দুর্বলতা রাখা ঠিক নয়।

গায়ে ব্যথা হলে 'রাসটাস্ক' খাবে। আর্নিকা নয়। আর্নিকা খাবে কেটে গেলে ও চোট লেগে বেদনা হলে। তবে C. B. Tina খেয়ে চল। ওতে দুর্বলতা কমবে। ভাবনা কোর না। আমি সর্বদা তোমার কথা ভাবি। তুমি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছ। এদিকে সব নিয়ম মতো চলছে। বাবু তার নিজের মনে দিন কাটাচ্ছে। বাড়িতে মিস্ত্রি লাগাবার ব্যবস্থা করছি। দেখি কতদূর কি হয়।

আদর নিও।

প্রীতিকুমার

14.06.66
Cal - 36

অভিন্নহৃদয়েষু,

আজ হয়ত তুমি পর্বতের উচ্চ শিখরে উঠেছ, যেখানে সাধারণের নাগালের বাইরে। জীবনের প্রতি ধাপে এমন ভাবে সর্বত্র উচ্চ শিখরে উঠে নিজে জীবনে প্রতিষ্ঠা আনতে হবে। ঐকান্তিকতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকলে সবই হবে। শুধু এগিয়ে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখতে হবে সর্ব বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করে। মনের জোর ও সাহস রাখতে হবে।

বাবু ভালো আছে। আমাদের দিন চলছে। শুধু তোমার আসার ২৮ তারিখের দিন গুনছি। বাবু স্কুলে যাচ্ছে।

DO NOT COPY

আমার আদর জেনো।

ইতি –
তোমার প্রীতিকুমার

05.06.68

অভিন্নহৃদয়েষু,

কোনও রাগ, অভিমান, ব্যথা বা দুঃখ তোমার প্রতি নেই। যদি কোনও বাধা দিয়ে থাকি, তার কারণ – তোমার যাতে কষ্ট না হয়। তুমি গিয়েছ তার জন্য আমার কোনও ক্ষোভ নেই, উপরন্তু তোমার জয়ই আমার জয়। তোমার আনন্দে আমার আনন্দ। তুমি যাতে সুখী হও তাই আমার একান্ত কাম্য জানবে এবং সেইরূপ আচরণই আমি করে থাকি। তুমি ও বাবু, এই দু'টির জন্য আমার সংসার। তোমাদের ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব মনে করে সংসার চালনা করে থাকি। ঈশ্বর বিশ্বাস করে আমার নিকট তোমাদের দুজনকে দিয়েছেন, সে বিশ্বাস রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আমার আছে। রোজ চিঠি দিচ্ছি। কেন পাচ্ছ না জানি না। আনন্দবাজার পত্রিকায় তোমার ফটো ও সংবাদ বেরিয়েছে, এতদিনে হয়ত পেয়ে থাকবে। আমি সদাসর্বদা তোমার সঙ্গে আছি। সব চিন্তা তোমাকে ঘিরেই জানবে।

আদর নিও।

ইতি –
শ্রী প্রীতিকুমার

(** রচনাকাল – মে, ১৯৯২)

DO NOT COPY

নিদ্রা এবং বেদনা **শ্রীমা**

"যখন কেহ নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে তখন সে ঘুমাতে পারে কী উপায়ে?"

তার জন্য যোগশক্তির প্রয়োজন। সর্বোত্তম পন্থা যা একেবারে অব্যর্থ তা হল দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

যখন দেহ যন্ত্রণায় ভোগে, যখন খুব বেশী জ্বর হয়, যখন তুমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়, বিশেষভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়, তখন একমাত্র করণীয় বিধান হল দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। তোমার প্রাণসত্তাকে নিয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যেয়ো। যদি তুমি একজন যোগী হও এবং তোমার যদি যৌগিক জ্ঞান থাকে তাহলে তুমি শরীরের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে পার, কিন্তু দেহের ঠিক উপরেই থাকতে হবে যেখান থেকে তুমি তোমার দেহকে দেখতে পাবে। প্রাণসত্তার যে গঠন নিয়ে তুমি দেহের বাইরে যাও তা যদি যথেষ্টরূপে বাস্তবতা অর্জন করে তাহলে তুমি বাইরে থেকে তোমার দেহকে দেখতে পাবে। তুমি তোমার দেহকে দেখতে পাও এবং তখন যে চেতনা এবং যে শক্তি তোমার থাকে তার সাহায্যে দিব্য শক্তির রশ্মি নিক্ষেপ করতে পার সেই স্থানে যেথায় দেহের বেদনা রয়েছে। উহাই সর্ব্বোচ্চ পদ্ধতি, এবং উহাই সুনিশ্চিত পন্থা বেদনাকে অপসারিত করার। শক্তি এবং জ্ঞান যদি থাকে তাহলে উহা অমোঘ। ঐ পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন ব্যাধি সারাতে পারা যায়। তবে উহার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা এবং অভ্যাস প্রয়োজন। হঠাৎ ঐ শক্তি কেউ অর্জন করতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় লোকে স্বাভাবিক ভাবে এবং আপনা আপনি নিজ দিকে সাহায্য করে যখন বেদনা অসহনীয় হয়ে পড়ে - তারা অচেতন হয়ে যায়। অচেতন হওয়ার অর্থ দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যে সব লোক তাদের দেহের সঙ্গে অতিরিক্ত রূপে বাঁধা নয় তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যখন দৈহিক যন্ত্রণা অত্যধিক হয়। তবে যখন তুমি দেহ থেকে বেরিয়ে যাও, তাকে একটি অচেতন জড় পদার্থ

রূপে ত্যাগ করে, তখন একজন জ্ঞানী এবং সদ্বিবেচনাপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যক। তোমাকে জাগরিত করবার জন্য জোরে জোরে ধাক্কা যেন না দেওয়া হয়। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যদি ভয় পেয়ে যায় এবং বালতি বালতি জল তোমার মাথায় ঢালতে থাকে তাহলে ফল খুবই খারাপ হতে পারে। তা না হলে অজ্ঞান অবস্থা ধীরে ধীরে শান্তভাবে বিশ্রামের অবস্থায় পরিণত হয়। কারণ তখন দৈহিক বেদনা বোধ করার মত বাহ্যিক চেতনা থাকে না। অচেতন অবস্থায় দেহ ক্রমশঃই স্থির এবং নিথর হয়ে পড়ে, তাই যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও দেহ বিশ্রাম লাভ করে।

ন্যূনতর পদ্ধতিও আছে, তাদের উপযোগিতাও ন্যূনতর। তবে সে সব পদ্ধতিও বড় সহজসাধ্য নয়। যে অংশটিতে বেদনা বোধ হচ্ছে তার সঙ্গে মগজের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। মগজে যদি বেদনার কম্পন উপস্থিত না হয় তাহলে বেদনার অনুভূতি থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ঐ পদ্ধতিই ডাক্তাররা অবলম্বন করেন যখন তাঁরা অসাড়কারী ওষুধের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। রোগগ্রস্থ স্থানটিকে অসাড় করে স্নায়ুর যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তখন আর বেদনা বোধ থাকে না, কিংবা খুব কমই থাকে। কিন্তু যৌগিক পন্থায় ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে উহা করতে হয়, এবং তার জন্য অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন। কেহ কেহ আপনা থেকেই উহা করতে পারে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। তোমরা যদি বেশী দূর যেতে না পার, তাহলে অন্য এক পন্থা আছে যা তোমাদের শক্তির আয়ত্তাধীন। বেদনার উপর দৃষ্টি দিতে নাই, বেদনাকে মনে রাখতে নাই, যন্ত্রণার কথা ভুলে যেতে হয়। বেদনার দিকে যতই লক্ষ্য দেওয়া হয় ততই তা মন্দের দিকে যায়। যদি তোমার বেদনার নিদর্শন বা ইঙ্গিত লক্ষ করতে থাকো, তার অনুভূতির প্রত্যাশা কর তাহলে নিশ্চিতভাবেই তুমি বেদনাকে আমন্ত্রণ করবে, তাকে উৎসাহিত করবে এবং বেদনার ধারাবাহিকতাকে সাহায্য করবে। সেই জন্যই উপদেশ দেওয়া হয় যে বেদনাকে ভুলবার জন্য হালকা ধরণের পড়ায় মনোনিবেশ করো অথবা কারো পড়া শোনো যাতে তোমার মন বেদনা থেকে সরে যায়।

DO NOT COPY

যখন ঘুমাতে যাও তখন লক্ষ্য হওয়া উচিত সমগ্রভাবে বিশ্রাম লাভ করা, অর্থাৎ দেহকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল করে দেওয়া, প্রাণসত্তার মধ্যে শান্তি আনা, মনের মধ্যে পরিপূর্ণ নীরবতা, এবং চেতনাকে সব রকম কাজের থেকে বহির্গত করে সচ্চিদানন্দের মধ্যে নিবেশিত করা। তা যদি করা যায় তাহলে ঘুম থেকে উঠার পর আসাধারণ শক্তি পরিপূর্ণ আনন্দ এবং গভীর শান্তি অনুভূত হয়। তবে ওটা করা সহজ নয়। তথাপি উহা করা সম্ভব। উহা একটি আদর্শ অবস্থা।

সাধারণ ভাবে উহা কখনই হয় না। নিদ্রিত অবস্থার সমস্ত সময়টি প্রায়ই বৃথায় নষ্ট হয় সর্ব রকমের অনিয়ন্ত্রিত চাঞ্চল্যে। বিছানায় শুয়ে লোকে এ পাশ ও পাশ করতে থাকে, হাত পা ছোঁড়ে, লাফায়, এমন কি কথা বলে এবং চীৎকার করে। তার অর্থ ঘুমের মাধ্যমে কোন বিশ্রামই লাভ হয় না।

প্রায়শঃ কতকগুলি স্বপ্ন আসে যা অপ্রয়োজনীয় এবং ক্লান্তিকর এবং তারা বিশ্রামে বাধা দেয়। ঐ সব স্বপ্নকে দূরে রাখতে হয়। ওসবকে এড়ানো যায় যদি শোবার পূর্বে একাগ্রচিত্ত হবার জন্য সামান্য প্রয়াস করা হয়। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যা সর্বোত্তম তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তোমাদের আস্পৃহা এবং প্রার্থনার সাহায্যে। ঐরূপ যোগাযোগ স্থাপিত করে নিদ্রা যেতে হয়। যদি কিছুমাত্র কৃতকার্যতার সহিত ঐ যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তাহলে এমন স্বপ্ন লোকে দেখে যা হয় ঘুমের মধ্যেই একটা অভিজ্ঞতা এবং তা মনে থাকে এবং জাগ্রত অবস্থার যে সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে লোকে উত্তর খুঁজে পায় না তাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নিদর্শন বা সঙ্কেত ঐসব স্বপ্নের মধ্যে থাকে। এমন হতে পারে যে কোনও একটি বিষয় সম্বন্ধে তোমাকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে অথচ তা তুমি করতে অক্ষম, কিংবা এমন হতে পারে যে তোমার চেতনায় এমন একটা কিছু আছে যা তোমার জাগ্রত চেতনায় তোমার কাছে সুস্পষ্ট নয়; কারণ তুমি তাকে লক্ষ্য করতে বা সাধারণ অবস্থায় চিনতে অভ্যস্ত নও, কিন্তু ওটা যে তোমার ক্ষতি করছে তা তুমি বোধ করছো। ঐ সমস্তই তোমার কাছে প্রতিভাত হতে পারে প্রকাশকারী স্বপ্নের মাধ্যমে। পূর্বে যা অস্পষ্ট ছিল স্বপ্নের

মধ্যে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তা নির্ভর করে না সারাদিন তুমি কী করছিলে তার উপরে। পরন্তু তুমি কী ভাব নিয়ে ঘুমাতে যাও তারই উপর নির্ভর করে। এক মিনিটের আন্তরিক আস্পৃহা ঘুমাবার আগে যদি থাকে তাহলেই তোমার নিদ্রা শক্তিপূর্ণ সাহায্যকারী হবে, তা তখন আর অন্ধকারে নিয়ে যাবার প্রতিনিধি হবে না।

নিদ্রা থেকে জেগে ওঠারও প্রকৃষ্ট পন্থা আছে, যেমন আছে ঘুমাতে যাবার পন্থা। যেই ঘুম ভাঙল অমনি লাফিয়ে না উঠে অথবা বিছানার উপরই এপাশ ওপাশ না করে, জাগবার সময় ধীর স্থির হয়ে থাকতে হয়; ধীরে ধীরে জেগে উঠতে হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন সঞ্চালন না করে। তোমার এক অস্পষ্ট অনুভূতি হবে যে বিশেষ একটা কিছু ঘটছে। স্থিরভাবে লক্ষ্য করতে হয়। বেশ মনোযোগের সহিত আন্তরিক ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ধীরে ধীরে তুমি অনুভব করবে এক ধরণের অর্ধস্মৃতি যা বাইরে প্রকটিত করবে তোমার বিগত রাত্রের ক্রিয়া কর্ম। একাগ্রচিত্ত হয়ে থাকতে হয়, নিথর নিশ্চল হয়ে। ধীরে ধীরে স্বপ্নের শেষের দিকটা মনে আসবে, তাকে অনুসরণ করে আরও পিছনে চলে যেতে হয়, সকল সময়ে স্থির থেকে। তখন প্রায় সমস্ত স্বপ্নটাই মনে আসতে পারে। নিদ্রিত অবস্থার ক্রিয়া কর্মই স্বপ্ন এবং তা বেশ মনোগ্রাহী।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে লোকে অনেক কাজই করে, তার বেশীর ভাগই মনে থাকে না। যদি তা মনে আনা যায়, যদি সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়, তাহলে স্বপ্নের ঘটনাকেও সংযত করা যায়। কোন বিষয় সম্বন্ধে সচেতন না হলে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। সচেতন হলেই তুমি তাকে তোমার নিয়মাধীন করতে পার। তুমি যদি তোমার রাত্রের কাজ কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পার তাহলে তোমার নিদ্রা বিশ্রামপূর্ণ হবে। কখন কখন এমন হয় যে ঘুম থেকে উঠে তুমি এমন ক্লান্ত বোধ কর যা ঘুমাতে যাবার সময়কার ক্লান্তি অপেক্ষা বেশী। তার কারণ ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজ তুমি কর, তোমার প্রাণ সত্তা দৌড়ে বেড়ায়, মনও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ঘোরাঘুরি করে। তাই যখন তুমি জেগে ওঠো তখন তোমার

DO NOT COPY

বিশ্রামের কোন অনুভূতি থাকে না। কখন কখন তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় মন্দ স্থানে যাও, যুদ্ধ কর, আঘাত পাও, আঘাত দাও এবং শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়। ঐ সমস্ত অযথা কাজই এড়ান যায় যদি তুমি ঘুমের মধ্যে সচেতন থাকো এবং স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখো।

শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে

গীতাপাঠের প্রয়োজনীয়তা

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ।। গীতা ধ্যানঃ ।।
সর্বোপনিষদ গাভী দোহিছেন ভগবান গোপালনন্দন।
পার্থ হন বৎসতুল্য আর সেই দুগ্ধামৃত পীয়ে সুধিগণ ।।

মাতৃস্তন্য পান করে শিশু বাঁচে, বাড়ে। গোদুগ্ধ পান করে মানুষ বাড়ে সুস্থ হয়, স্বাস্থ্য লাভ করে। অনুরূপ গীতার উপদেশামৃত পান করে মুমুক্ষু মাত্রেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। কারণ এই গীতাবাণী সমস্ত বেদ-বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রের সারাংশ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ক্ষুধায় যেমন সুষম বিশুদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন, পিপাসায় প্রয়োজন সুনির্মল জল; ইহার ব্যতিক্রম হলে ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্ত হলেও রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ষোল আনাই থেকে যায়। কাজেই সুষম ও নির্মল পথ্য পানীয় মানবের একমাত্র কাম্য। এই সম্পর্কে শ্রী ভগবান বললেন,

DO NOT COPY

অত্যাচার অনাহার অতিনিদ্রা অতি জাগরণ।
করে যেই হে অর্জুন! যোগ তার না হয় কখন ।।
যুক্তাহার ও বিহার বিধিমত কর্ম যেই করে ।
পরিমিত নিদ্রে জাগে তার যোগ সর্ব দুঃখ হরে ।।

রোগাক্রান্ত হলে উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শক্রমে সঠিক নিয়মে নিয়মিত ঔষধ সেবন করলে রোগ সারে। ব্যতিক্রম হলে রোগ বাড়ে এবং কালে জীবন সংশয় হয়।

শ্রীমান অর্জুন তো যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। শোক সংবিগ্ন হয়ে ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না। আত্মীয়দের হত্যা করে পাপভাগী হতে চাই না। স্বর্গরাজ্য আমার দরকার নেই।

সঙ্গেই পার্থসারথি ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন ভবরোগ-বৈদ্য। তিনি বললেন, সে কি?

এমন সঙ্কটকালে হে অর্জুন! আর্য-অনুচিত
অস্বর্গ অকীর্তি কর মোহ তব কেন উপস্থিত?
হৃদয় দৌর্বল্য ক্লৈব্য শোভনীয় তোমাতে না হয় ।
দৌর্বল্য ক্লীবতা ত্যজি যুদ্ধ হেতু উঠো ধনঞ্জয় ।।

অজ্ঞতা দূরীভূত করার জন্য যেমন জ্ঞানবান পুরুষের আশ্রয় নিতে হয়, তাঁর আদেশ উপদেশ অনুযায়ী ক্রিয়ানুষ্ঠানও অভ্যাস করতে হয়; ইহাতে শিষ্য বা ছাত্র যথাযথ জ্ঞানলাভ করতে পারে। বিধিবদ্ধ উপায় দ্বারাই জীবন হয় গঠিত এবং সর্বক্লেশ দূর হয়। অনুরূপ গীতার প্রবক্তা বললেন –

শরীর মস্তক গ্রীবা দৃঢ় ঋজু রাখি সমতনে।
নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রেখো একভাবে সংযত নয়নে।
অতঃপর জিতচিত্ত প্রশান্তাত্মা ব্রহ্মচারী হয়ে ।

DO NOT COPY

সন্নিষ্ঠ মৎপর হই সমাধিস্থ হইবে নির্ভয়ে ।।

এসব যদি না করতে পার তবে সর্ব সমর্পণ কর। এরূপ সমর্পণকারী আমার অতিপ্রিয়। এই যোগী তপস্বীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কর্মীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তুমি যোগী হও। সে যোগী কিরূপ?

মোর ভক্ত যেই যোগী মোরে ভজে
পূজা করে পরম শ্রদ্ধায় ।
মম মতে সেই যোগী যুক্ততম
প্রিয় মোর শ্রেষ্ঠ বলি তায় ।।
এই জ্ঞানবান ভক্ত যোগীই জানতে পারে "বাসুদেবঃ সর্বমিতি।"
জ্ঞানবান বহু জন্ম অতিক্রমি দেখিবারে পায়
"বাসুদেব সর্বঠাঁই" সে মহাত্মা দুর্লভ ধরায় ।।

অন্ধকে আশ্রয় করে অন্ধপথে অন্ধমতে বিচরণকারী অতিশয় কুটিলগতি প্রাপ্ত হয় এবং কেবল রোদন করে। পরন্তু জ্ঞানচক্ষুষ্মান জ্ঞানালোকপূর্ণ পথে গমন করে, প্রজ্ঞান অভয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ও ভূমা সুখ লাভ করে।

ভগবান স্বয়ং নারায়ণ তাই বললেন –

অবসন্ন নাহি হয়ে উদ্ধারিবে নিজেকে নিজেই ।
কেননা আত্মার বন্ধু কিম্বা শত্রু হয়তো নিজেই ।।
নিজেই নিজেকে জয় যে করেছে সে মিত্র নিজের ।
যে জন নিজেকে জয় করে নাই সে শত্রু নিজের ।।

এই জগত এই জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্র। প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করেই জীবকে বাঁচতে হয়। এই সংগ্রামকে কেহই উপেক্ষা করতে পারেন না। জীবন যাপন চারণ ও অয়নের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রভৃতির উন্নতির জন্য সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী, এই সংগ্রামে জয়ী হলে জীব হয় উজ্জীবনের অধিকারী। কাজেই ইহাতে শঙ্কিত হয়ে রণে

DO NOT COPY

ভঙ্গ দেওয়াটা মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। ইহাতে মানুষ মাত্রেরই অপযশ সংঘটিত হয়। বিশেষ করে অর্জুনের মতো ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রণে ভঙ্গ দেওয়াটা অপকীর্তি বৈ তো নয়। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে ইহা মৃত্যুরই সমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীভগবান বললেন –

যুদ্ধে হত হলে পাবে স্বর্গভোগ মহীভোগ জয়ে ।
উঠিয়া দাঁড়াও পার্থ যুদ্ধ হেতু স্থির মতি লয়ে।।
সুখ দুঃখ লাভালাভে জয়াজয়ে হয়ে সমজ্ঞানী ।
যুদ্ধেতে উদ্যুক্ত হলে পাপে লিপ্ত নাহি হবে তুমি।

মানুষের স্বধর্ম সাধনেই সিদ্ধি ঘটে। নিষ্ঠাসহ স্ব স্ব কর্ম করে সেই কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পিত হলে তাতেই সর্বার্থসিদ্ধি হয়। কারণ তিনিই সকলের ফলদাতা।

গতির্ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিত্যবীজ আমি স্থিতি স্থান ।
সুহৃদ্ রক্ষক আমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিধান।।

আরো বললেন –

অনন্য চিত্তেতে মোরে যাঁরা নিত্য করেন ভজন ।
আমি যে তাঁদের তরে যোগক্ষেম করিতো বহন।

কাজেই ভগবান অর্জুনকে বললেন, আমার শরণ লও, আমার প্রীত্যর্থে কর্ম কর, আমাকে পূজা কর, নমস্কার কর, তুমি আমার অতিপ্রিয়। আমি অঙ্গীকার করছি তুমি সর্বধর্ম ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ কর, আমার পথে চল, আমি সর্বপাপ হতে তোমাকে মুক্তি দেব। কেননা আমার স্বরূপ ?

আছেন পুরুষোত্তম যাঁকে লোকে পরমাত্মা কয় ।
ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হয়ে রক্ষে সেই ঈশ্বর অব্যয় ।।
অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর আমি ক্ষরের অতীত ।
আমিই পুরুষোত্তম সেইহেতু ত্রিলোক বিদিত।।

DO NOT COPY

এইভাবে পার্থ ও পার্থসখা শ্রীভগবান যেখানে বিদ্যমান, সেখানে শ্রী, বিজয়, ধ্রুবার্নীতি ও অভ্যুদয় নিত্য বর্তমান। একথা বললেন অমাত্য সঞ্জয়।

কাজেই গীতা হলো ত্যাগমূর্তি । গীতামন্ত্রে প্রবোধিত হয় জীবন। কাম ক্রোধ লোভ ভোগ রাক্ষসীদের কবল হতে নিষ্কৃতির পক্ষে গীতা বাণী অনবদ্য সুতীক্ষ্ণ শায়ক স্বরূপ। এই হেতু গীতার অমূল্য উপদেশ সর্বকালে সর্বলোকের পক্ষে বিশেষ করে মুমুক্ষু মাত্রের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। বর্তমান জগতে হিংসা-হননশীল, সংহতিহীন সমাজের পক্ষে গীতা হল-

আলোকস্তম্ভ, ধ্রুবতারা বৈ তো নয়।

সর্বশেষে –

যাঁহার কৃপায় মূক কথা কয় পঙ্গুও যে হয় গিরিপার।
পরম আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ করি নমস্কার ।।

উৎস সন্ধানে **শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার**

আজকাল চারিদিকেই উৎস-সন্ধানের যেন একটা হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ্, প্রত্নতাত্ত্বিক কেহই আর বাদ যাইতেছেন না। যুগ যুগ প্রচলিত হিন্দুরামায়ণের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া, একদিকে যেমন এতকালের রামভার্য্যা জনকনন্দিনী সীতাঠাকুরানীকে এককালের রামভগিনী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে, অন্যদিকে তেমনি সিন্ধুর মহেঞ্জোদারোই প্রকৃতপক্ষে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা কিনা, উহা লইয়াও ভাবনা চিন্তা সুরু হইয়া গিয়াছে। এতদিন ধরিয়া রামায়ণ মহাভারতের কথাকেই উহাদের প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া আমরা যে ভুল করিয়া আসিতেছিলাম, পণ্ডিতগণের কৃপায়

DO NOT COPY

আমাদের সে ভুল এখন ধীরে ধীরে ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। উৎসের সন্ধান না করিয়া কোন কিছুকেই এখন আর স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলিতেছে না।

যুগের হাওয়া গায়ে লাগিয়া আমাদের মনেও অনুরূপভাবে উৎস সন্ধানের একটি ক্ষুদ্র বাসনা জাগিয়া উঠিল। তবে রামায়ণ মহাভারতের কথা লইয়া নয়। মনে পড়িয়া গেল চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব মহাজনদের কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে লইয়া ইহাদের এতসব যে জল্পনা কল্পনা - একাধারে রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রভৃতি যে সকল ভাবের কথা*, উহাদের মূলে আদৌ কোন শাস্ত্র প্রমাণ অথবা শাস্ত্রযুক্তি আছে কী? অবশ্য একথা অনস্বীকার্য্য যে, মহাপ্রভুকে কখনও কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া রাধা! রাধা! করিতে, আবার কখনও কখনও রাধিকার ভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া ব্যাকুল হইতে দেখিয়া, তাঁহার তপ্তকাঞ্চনসদৃশ ভাববিহ্বল দেহে একাধারে রাধাকৃষ্ণের ভাব আরোপ করা, পরমপণ্ডিত গৌরাঙ্গপ্রেমিক বৈষ্ণবকবিগণের পক্ষে একটি নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, এবং এজন্য তাঁহাদিগকে আদৌ কোনরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই। কিন্তু উহা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, কেবল উচ্চাঙ্গের কবিত্ব অথবা বহুজনবঞ্চিত ভাব বলিয়াই তো কোন কিছুকে শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা দেওয়া চলে না।

এখন, শাস্ত্র বলিতে আমরা কি বুঝিব? উত্তরে বলিতে হয়, আমাদের সকল ধর্মমত ও পথের ভিত্তি অথবা উৎস যে প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ উপনিষদ্, ব্যাসসূত্র এবং ভগবদগীতা, উহাকেই বুঝিতে হইবে। এবং সকল ধর্মমত ও পথের কথায়, হালের অবতার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণকেও বাদ দিলে চলিবে না। কেননা, যখন শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বলা হয় - 'প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র।' এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিতে শোনা যায় 'এখানকার কথা বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে', তখনও দেখা যায়, ইঁহাদের কথা বস্তুতঃ বেদবিধি ছাড়া নয়।

প্রথমেই উপনিষদের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নামোল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কলিযুগে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা তো দূরে থাক, দ্বাপরে নন্দনন্দন হইয়া গোপীপ্রেম-সম্ভোগের কোনরূপ বাসনার

কথাও তাঁহাকে কোথায়ও ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিতে শোনা যায় না। কাজেই, সে কথা ছাড়িয়া দিতে হইল। অতঃপর ব্যাসসূত্র। সেখানেও তথৈবচ। বাকী থাকিল ভগবদগীতা।

প্রথমেই মনে পড়িয়া গেল গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসবাণী - 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্তাং তথৈব ভজাম্যহম্' অর্থাৎ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়) - 'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।।' কেবল অন্যের বেলাতেই বা কেন? কৃষ্ণের নিজের বেলাতেও তো এই একই কথা বটে! কিছুটা আশার সঞ্চার হইল! কিন্তু গঙ্গাসাগরের গঙ্গাকে গোমুখের গঙ্গা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, কেবল কথা বা কল্পনাই তো যথেষ্ট নয়! অগত্যা, একের পর এক করিয়া গীতার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

শুরুতেই অর্জুনের বিষাদযোগ। যুদ্ধার্থে সাজিয়া গুজিয়া ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াও বাঁকিয়া বসিলেন অর্জুন – কিছুতেই তিনি যুদ্ধ করিবেন না। কেনই বা করিবেন? যাহাদের জন্য ধনজন, সুখসমৃদ্ধি, রাজ্যলাভ, তাহাদিগকেই হত্যা করিয়া সেই রক্তাক্ত ভোগৈশ্বর্য্য উপভোগ করা অপেক্ষা, বনে যাওয়া অথবা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও অনেক ভাল নয় কী? বরং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিবেন, তবুও আত্মীয়স্বজন ও গুরুবধ করিয়া মহাপাতকের ভাগী হইতে পারিবেন না!

অর্জুনের এই বিষাদযোগ হইতেই গীতার উৎপত্তি। অনেক বকাবকি-ঝকাঝকি করিয়াও তেমন কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া, অবশেষে সারথি কৃষ্ণকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া একে একে অর্জুনকে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ, অক্ষরব্রহ্ম যোগ, রাজগুহ্যযোগ প্রভৃতি নানা তত্ত্বকথা শুনাইবার পরে যখন দশম অধ্যায়ে আসিয়া দিব্যভাবের গভীর হইতে গভীরতর প্রেরণায় বলিতে শোনা যায়-

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমণ্বিতাঃ।।

[আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ। আমা হইতেই সবকিছু প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধিমানেরা ইহা জানিয়া প্রেমাবিষ্টভাবে আমারই ভজনা করিয়া থাকেন।] তখন, বোধহয় এইভাবে প্রেমাবেশের কথাটি মনে উদয় হওয়া মাত্রই, কৃষ্ণের দৃষ্টিপথ হইতে কেবল অর্জুন কেন সমগ্র কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, এবং উহার পরিবর্তে তাঁহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছিল বৃন্দাবনের বনস্থলী ও সেই সঙ্গে তদ্গতপ্রাণা গোপিনীদের চিত্রপটটি, যাঁহার ফলেই ইহার ঠিক পরের দুইটি শ্লোকে তাঁহাকে হঠাৎ বলিয়া উঠিতে দেখা যায়-

মচ্চিতঃ মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।

কথাটির কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে না পারিলেও, এরূপ মনে করা ভিন্ন কৃষ্ণের এই ভাবান্তরের অন্য আর ব্যাখ্যাই বা কী হইতে পারে? অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার পক্ষে এসকল কথাকে তো একান্তই অবান্তর অথবা অর্থহীন বলিয়াই মনে হয় নাকি? কাজেই, এসকল দেখিয়া শুনিয়া বলিতেই হয় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সারথিবেশে অশ্বের বল্গা ধরিয়া মহাবীর অর্জুনকে যুদ্ধের প্রেরণা যোগাইতে গিয়াও, সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল না কৃষ্ণের পক্ষে ব্রজগোপীগণের প্রেমের কথা ভুলিয়া থাকা!

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরেও আরও ছত্রিশ বৎসর কৃষ্ণকে দ্বারকাধীশরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইয়াছিল যখন অন্তঃপুরে রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী আদি মহিষীগণ ও বাহিরে (যাহাদের দ্বারা তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই একদিন যদুকুল ধ্বংস হইয়াছিল) সেইসব যদুকুল কুলাঙ্গারদের লইয়া কীভাবে যে তাঁহার দিন কাটিতেছিল, উহা সহজেই অনুমেয়। ইহা সত্ত্বেও, দিনেকের জন্যও যে তিনি সরলা ব্রজবালাগণের সুখস্মৃতি ও অহৈতুক প্রেমের কথা ভুলিয়া থাকিতে পারেন নাই, আমাদের শাস্ত্রপুরাণে সেরূপ প্রমাণের কোনই অভাব নাই।

এরপর যখন একদিন অতর্কিতে জরাব্যাধের শরে তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তখনও সেই অন্তিম-মুহূর্তেও তাঁহাকে যে, হা-রাই! হা-রাই! করিতে করিতেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করাটাও বোধ হয় কিছু অস্বাভাবিক নয়!

কাজেই বলিতে হয়, আমাদের শাস্ত্রের অলঙ্ঘ্যবিধানে যদি একদিন রাজর্ষি ভরতকে মৃত্যুকালে হরিণ চিন্তা করিবার ফলে পরজন্মে হরিণদেহ প্রাপ্ত হইতে হইয়া থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও সারাজীবন ধরিয়াই কেবল রাধা! রাধা! করিবার ফলে যে জন্মান্তরে রাধাদেহ প্রাপ্তি ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী? ইহা ছাড়াও, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখেরই কথা রহিয়াছে-

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।

হে কৌন্তেয়! যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে দেহত্যাগ করেন, তিনি সর্বদা সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত থাকায় [পরজন্মে] সেই ভাবই প্রাপ্ত হন।

এবারে শ্রীমতী রাধিকার কথা। প্রস্থানত্রয়ে অর্থাৎ উপনিষদাদিতে স্পষ্টাক্ষরে কোথাও ব্রজগোপীগণ তথা রাধিকার নামোল্লেখ না থাকিলেও, চৈতন্যযুগের বহুপূর্ববর্তী ব্রহ্মবৈবর্তাদিপুরাণ-বর্ণিত শ্রীমতী রাধিকাকে কোন ক্রমেই একটি কাল্পনিক চরিত্র বলা চলে না। এবং তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম ও বিরহকেও কেবল কবিকল্পনার সামগ্রী বলিয়াই মনে করিবারও কোন কারণ নাই। অতএব সে ক্ষেত্রে রাধ! রাধা! করিতে করিতে যদি কৃষ্ণের পক্ষে রাধাদেহপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে, তবে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! করিয়া তাঁহারই বা কেন পরজন্মে কৃষ্ণদেহপ্রাপ্তি হইবে না?

এর পরের কথা একই দেহে এইভাবে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন ঘটিল, ভিন্ন ভিন্ন দেহেই বা উভয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটিল না কেন? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, কেবল বৈষ্ণব মহাজনগণের দৃষ্টিতেই ন্য, আমাদের ধর্মেতিহাস পর্য্যালোচনা

করিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় রাধাকৃষ্ণ-ভাবধারায় উপযুক্ত ধারক ও বাহক হইবার মত দ্বিতীয় কোন আধারের অস্তিত্ব সমগ্র চৈতন্যপূর্ব-যুগে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই 'রাধাকৃষ্ণ একতনু' হইয়া শ্রীচৈতন্য দেহাশ্রয়ে প্রকটিত হওয়া ছাড়া বোধ হয় কোন আর গত্যন্তরই ছিল না! ইহা ছাড়াও, ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিলে আবারও তো সেই বিরহ যন্ত্রণার ভয় ছিল! তবে কথা আছে-'স্ব-ভাব যায় না ম'লে।' আর তাই-ই বোধ হয় উভয় ভাবের আশ্রয় শ্রীচৈতন্যকে কখনও রাধা! রাধা! কখনও বা কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! করিয়া বিরহব্যথায় এত কাতর হইতে দেখা যায়!

এবারে শেষ প্রশ্ন - কেনই বা এইরূপ বহিঃরাধা, অন্তঃকৃষ্ণভাব? শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাসুলভ গৌরকান্তিই যে ইহার মূল কারণ, সেকথা বলাই বাহুল্য। আনুষঙ্গিকভাবে আর একটি কথা। এক মতে বোধ হয়, কলিতে অবতার নাই। অন্য মতে, 'ছন্নঃ কলৌ' অর্থাৎ কলিযুগে অবতার প্রচ্ছন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় - বাবুর গোপনে জমিদারী দেখতে আসা! বৈষ্ণব মহাজনগণের জয় হোক! এইভাবে গৌরাঙ্গের গৌরদেহের আবরণে কলিকালে কৃষ্ণকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহারা অন্য সকল মতের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন বলিতে হয়।

অলমতিবিস্তারেন! আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, এখানেই আমরা আমাদের উৎস-সন্ধান শেষ করিলাম।

"বুদ্ধি খুব উন্নত এবং বিকশিত হলেই যে সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হবে, তার কোনও যুক্তি নেই; বরং আমরা প্রায় প্রত্যহই দেখতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হয়েছে, আত্মার সেই পরিমাণে অবনতি ঘটেছে।"

-------- স্বামী বিবেকানন্দ

DO NOT COPY

মন চলে হিমাচলে **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

(গত সংখ্যার পর)

ধরমশালা থেকে কিছুটা উত্তরে আর খানিকটা পশ্চিমে প্রায় ১১৮ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ফুলে ফুলে ভরা ওক-রডোডেনড্রন-পাইন-দেবদারুতে ছাওয়া রূপসী ডালহৌসি। মার্চের মাঝামাঝি সে সময় হিমাচলে তেমন ভিড় হতো না, তাই অগ্রিম বুকিং ছাড়াও মানালী, মাণ্ডী অথবা ধরমশালায় ঘর পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। আর ডালহৌসি? সিমলা-কুলু-মানালীর তুলনায় ট্যুরিস্ট সমাগম কম বলেই বোধ হয় 'কোহিনুরের' মত সুন্দর হোটেলে ঘর পেয়ে গেলাম অবিশ্বাস্য সস্তায়। অথচ উত্তর জুড়ে একদিকে ধৌলাধার আর অন্যদিকে পীরপাঞ্জাল নিয়ে ডালহৌসির সুনামই তার নৈসর্গিক শোভার জন্য। চেনাব-রবি-বিপাশার মত খরস্রোতা নদী বয়ে চলা চাম্বা উপত্যকায় পাঁচ পাহাড় নিয়ে ১৩ বর্গ কিলোমিটার এই শহরের প্রকৃতিতে স্কটল্যান্ডের আদল খুঁজে পেয়েছিলেন এক ইংরেজ গভর্নর জেনারেল। ১৮৫৩ তে চাম্বারাজের কাছ থেকে জমি কিনে প্রথমে ব্রিটিশ স্বাস্থ্যনিবাস আর সেনানিবাস গড়া হলে, কালে কালে বাংলোধর্মী বাড়িঘর নিয়ে ১৯২০তে হিলস্টেশন রূপে সুনামের শিখরে ওঠে ডালহৌসি। GPO চকে শহরের শুরু, তারপর পাহাড়ি পেঁচানো পথ শহর পরিক্রমা করে শেষ হয়েছে বাসস্ট্যান্ডে। বাঁয়ে ট্যুরিস্ট অফিস আর ডাইনে ডালহৌসি ক্লাব ড়েখে বাসস্ট্যান্ডের মাঠায় ঢাপে ঢাপে হোটেল। এঈ ওণচোলতা ঘিঞ্জি হলেও আমাদের হোটেল কোহিনুর ছিল কিছুটা নির্জনে। তার চেয়েও নিভৃতে 'ডালহৌসি ক্লাব হাউসে' যখন পেলাম অপার শান্তির ঠিকানা তখন সাহেবি গন্ধে ভরপুর এই ক্লাব হাউসে পরের দুটো দিন থেকে যেতে দ্বিধা করিনি।

শহরের প্রাণকেন্দ্র অবশ্যই গান্ধী চক। এখান থেকে দক্ষিণে নির্জন শান্ত পরিবেশে 'পঞ্চপুল্লা' জলপ্রপাত। পথেই দেখেছি সর্বরোগহর সাতধারা। সাত নল বেয়ে যে জল আসছে তার থেকে জল পান করি আমরা সবাই। কাছেই শহীদ স্মারক ভগত সিং-এর কাকা অজিত সিং-এর স্মরণে। এই অজিত সিং ছিলেন

নেতাজী সুভাষের একনিষ্ঠ অনুরাগী। সুভাষ নিজেও এসেছিলেন ডালহৌসিতে ১৯৩৭ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে। যে হোটেল মেহেরসের ১২ নম্বর ঘরে তিনি ছিলেন তাও এখন উৎসাহীদের দ্রষ্টব্য। জনশ্রুতি বাসস্ট্যান্ড থেকে ১ কিলোমিটার দূরের ঝরনার জলে আরোগ্য লাভ করেন সুভাষ। ঝরনার নাম তাই হয়েছে 'সুভাষ বাওলি'। ডালহৌসিতে তিনরাত কাটাবার সুবাদে সেখান থেকেই ঘুরে নিয়েছিলাম চাম্বা আর খাজিয়ার। এই সফরে মোহিত অথবা মারুতি আমাদের সঙ্গে ছিল না, সঙ্গী হয়েছিল বছর ২২শের ছটফটে তরুণ সুরিন্দর তার টাটা সুমোকে বাহন করে। ডালহৌসি থেকে খাজিয়ার মোটামুটি ২২ কিলোমিটার আর চাম্বা সেখান থেকে আরো প্রায় ২৪ কিলোমিটার। তবে চাম্বায় আমরা খুব বেশি কিছু দেখিনি। বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে ১০ শতকের চামুন্ডা মন্দির আর ডোগরা বাজারের পিছনে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ছাড়া তেমন কিছু দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। তবে, ভ্যালি অফ মিল্ক এন্ড হানি বলে খ্যাত চাম্বার দশম শতাব্দীর রাজা সহিল বর্মার মেয়ে চম্পাবতীর গল্প আমরা অবশ্যই শুনেছি, যার কারণে এই স্থানে রাজার নতুন রাজধানী হয় চম্পা তথা চাম্বা। চাম্বাকে কিমি. সময় দেওয়ার আসল কারণ ২X১ কিলোমিটারের অপূর্ব উপত্যকা খাজিয়ার, ১৯৬০ মিটার উচ্চতার যে স্থানকে লর্ড কার্জন বলেছিলেন 'সুইজারল্যান্ড অব ইন্ডিয়া'। নীল আকাশের নীচে সবুজ বনানী আর ফিকে সবুজ ঘাস। ওক পাইন আর দেওদার ছাওয়া শান্ত সুনিবিড় গহন বনের মাঝে ছোট্ট মায়াময় লেক, পাড়ে আবার গল্‌ফ কোর্স - সব মিলে যেন এক টুকরো স্বর্গ! লেকের জলে ভাসন্ত দ্বীপ। খাজিনাগের বাসও নাকি লেকের জলে। সেই থেকেই নাম হয়েছিল খাজিনাগ - কালে কালে খাজিয়ার। দুঃখের ব্যাপার এককালে অথই জলের লেক আজ মজতে বসেছে। লেকের লাগোয়া ১২ শতকের সোনায় মোড়া চুড়োর খাজিনাগ মন্দিরে উঁকি দিয়ে দেখেছি পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্তি। মানালীর মত ভীম পত্নী হিড়িম্বার মন্দিরও রয়েছে এখানে। তবে খাজিয়ারের আসল সৌন্দর্য তার প্রকৃতি। সে প্রকৃতিকে দেহ মনে শুষে নিতে থাকতেই পারেন HPDC র হোটেল 'DEVDAR'-এ। আমরা অবশ্য খাজিয়ারে থকিনি, তাই দিনে দিনে চাম্বা খাজিয়ার দেখতে গিয়ে

চাম্বা কিছুটা অবহেলিতই থেকে গেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি সিমলার ম্যালে বরফ না থাকলেও কুফরীর পথে যেমন বরফ পেয়েছি , ডালহৌসি খাজিয়ারের পথেও বরফ তার চেয়ে কম ছিল না। বিপদ ঘটেছিল সেই বরফ পথেই। কেন যে টাটা সুমো সেদিন বেঁকে বসেছিল তা আজ মনে নেই। তবে এটা মনে আছে ভালোরকম পথে বসেছিল পথের সঙ্গী আরেকটি যাত্রীবাহী গাড়িও। 'ম্যায় আভি জিন্দা হ্যায়' বলে হাত লাগাবার পর সুরিন্দরের তারুণ্যের কাছে আমাদের গাড়ি বশ মানলেও অন্য গাড়ির অচেনা যাত্রীরা কিন্তু সত্যিই বিপদে পড়েছিল। পথের বিপদে অন্যকে সাথ দেওয়া পাহাড়ি পথের স্বাভাবিক ধর্ম তাই একটু চাপাচাপি হলেও ব্রেকডাউন গাড়ির যাত্রীদের নিয়ে আমরা ফিরে এসেছিলাম ডালহৌসিতে। বিগড়ে যাওয়া গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার কখন ফিরেছিল কে জানে!

সুভাষ চক থেকে গান্ধী চকের হাজার দুয়েক পদক্ষেপকে প্রায় অভ্যাসে পরিণত করার সময় মোহিত অথবা সুরিন্দরের সহায়তা আর দরকার ছিল না, তাই ডালহৌসি থেকেই তাদের বিদায় জানিয়ে পায়ে পায়ে কাটিয়ে ছিলাম ডালহৌসির তৃতীয় দিনটা। অমৃতসর থেকে কলকাতা ফেরার অকাল তখত এক্সপ্রেস আমাদের নিয়ে চলতে তখনো তিন দিন বাকি। তবু যেন সমতলের ডাক আর আমাদের পাহাড়ে থাকতে দিল না। সমতলের মানুষের এই বড় দোষ! পাহাড়ের আকর্ষণে সেখানে ছুটে যাওয়াও চাই অথচ কয়েকদিন যেতে না যেতেই সমতলের টান তাদের কান ধরে নীচে নামিয়ে আনে। চাইলে খাজিয়ারে একটা রাত থেকে 'কালাটপে'র শোভা দেখার সুযোগও আমাদের ছিল, কিন্তু ঐ যে বললাম - সমতলের টান! ডালহৌসির বাসস্ট্যান্ড থেকেই পাওয়া গেছিল অমৃতসরগামী বাস। পাঠানকোট হয়ে প্রায় ১৮৮ কিলোমিটার পথ পেরোতে সে বাসের সময় লেগেছিল সাড়ে চার ঘন্টার সামান্য বেশি। বাসস্ট্যান্ড থেকে অটোওয়ালা যে হোটেলে নিয়ে এসেছিল সাত তাড়াতাড়ি সেখানে চেক ইন করলেও ঘণ্টা দুয়েক পরে চেক আউট করতে হয় চরম অব্যবস্থা দেখে। আজ সে হোটেলের কি অবস্থা জানি না, নামটাও মনে নেই যে পাঠকদের সাবধান করে দেব। অমৃতসরে এসে স্বর্ণমন্দির চত্বরে থাকার ইচ্ছে

আমার প্রথম থেকেই ছিল। তবে তা কমন বাথের শ্রীগুরু রামদাস নিবাসের মত কোথাও নয় বরং বাথ সংলগ্ন শ্রীগুরু নানকের মত কোন নিবাসে। ঘর অবশ্য চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল না, অপেক্ষার লাইনে বসে যাত্রীদল ঘণ্টা গুণছিল কখন তাদের ভাগ্যে ঘরের দরজা খোলে। আমাদের জন্য অপেক্ষাটা ছিল মাত্র দশ মিনিটের-সৌজন্যে ইন্ডিয়ান আর্মির আইডেনটিটি কার্ড। মেজর সাহেব কে খাতির করে মাত্র ৫০ টাকার ডোনেশনে যে ঘর দিল, তা অনেক আচ্ছা হোটেলের ঘরকেও হার মানায়। ঘরের একদিকে পর্দা ঢাকা কাঁচের দেওয়াল। পর্দা সরালেই স্বর্ণমন্দির একেবারে চোখের সামনে। আর মন্দিরের দরজা? হাঁটতে হবে বড়জোর ৬০০ মিটার। এমন কি ব্রিটিশরাজের কলঙ্ক স্বরূপ জালিয়ানওয়ালাবাগও ছিল আমাদের পায়ে হাঁটা পথে।

১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর থেকে চলার পথে জি টি রোডের ধারে এক জলাশয় দেখে তাকে ঘিরে এক শহর গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন শ্রী গুরু নানক। ১৫৭৭ সালে আকবরের ফরমানে অনন্তকালীন অধিকার পেয়ে চতুর্থ শিখগুরু রামদাস সে স্বপ্ন পূরণ করেন। পঞ্চম গুরু অর্জন সংস্কারের সাথে আয়তন বাড়িয়ে আয়তাকার সরোবরের মাঝে হরমন্দির গড়েন ১৬০১ সালে। সরোবরের জল শুদ্ধ করে অমৃত তুল্য হলে নাম হয় অমৃতের সরোবর তথা অমৃতসর। কালে কালে শিখধর্মের পবিত্র তীর্থ হয়ে ওঠে এই শহর। ১৭৬১ তে আহম্মদশাহ দুরানী অমৃতসর জয় করে মন্দির ধ্বংস করলে ১৭৬৪ তে তা আবার তৈরী হয় নতুন করে। ১৮৩০ এ আজকের ত্রিতল মর্মরের হরমন্দির গড়েন রণজিৎ সিংহ। মন্দিরের গম্বুজ ৪০০ কেজি সোনা দিয়ে মুড়ে কারুকার্যময় রূপোর দরজাতেও লাগিয়ে দেন সোনার পাত। সেই থেকে নাম বদলে হরমন্দির হয় স্বর্ণমন্দির। মন্দিরের মূল দরজা ছাড়াও রয়েছে আরো চার দরজা, অর্থাৎ হিন্দু চার সম্প্রদায়ের কাছেও মন্দির অবারিত। আজকের গুগল বলছে যে কোন ধর্মের লোকই মন্দিরে যেতে পারে এমন কি মুসলিম সম্প্রদায় এখানে নামাজ আদায় করলেও বলার কিছু নেই তবে বাস্তবে ‘রাব নে বানা দে জোড়ি’তে শাহরুখ খানকে পবিত্র সরোবরের জল মাথায় ঠেকাতে দেখা গেলেও

সাধারণ ইসলাম ধর্মালম্বীরা এখানে আসে না বললেই চলে। মন্দিরের দর্শনী দেউরিতে যে হালুয়া প্রসাদ মেলে তা এককথায় চমৎকার! হালুয়া হজম হলেও হাতের ঘি যেন থেকেই যায়। শিখ ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর অতীত প্রাণবন্ত হয়েছে প্রবেশদ্বারে ক্লকটাওয়ার মিউজিয়মে। দ্বিতলের তোষাখানায় রয়েছে মহারাজ রণজিৎ সিংহকে দেওয়া নিজামের উপহার মনিমানিক্য খচিত চন্দ্রাতপ সহ আরো অনেক দর্শনীয় জিনিষ। তবে সব দিন নয়, সে সব দেখা যায় কেবল গুরুরামদাসের জন্মদিনেই। স্বর্ণমন্দির লাগোয়া সরোবরের তীরে স্বর্ণ গম্বুজ শিরে শ্বেত শুভ্র পাঁচতলায় 'অকাল তখত' অর্থাৎ চিরকালের দেবতার সিংহাসন ভবন। এখানে রয়েছে শিখ গুরুদের ব্যবহৃত পবিত্র অস্ত্র শস্ত্র। শিখধর্মের পার্লামেন্ট হাউস এই অকাল তখত। এখান থেকেই ধর্মীয় আর সামাজিক বিধান দেয় শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে সরাই এর পিছনে বাগানের মাঝখানে ন'তলা উঁচু বাবা অটল সাহিব গুরুদ্বারা। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র বাবা অটলরায়ের মৃত্যুতে এই স্মারক তৈরী হয়েছিল ১৬২৮ সালে। আর রয়েছে ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর করতে ১৬শতকের লঙ্গরখানা, যা কিনা প্রচলন করেছিলেন তৃতীয় গুরু অমরদাস। সেই থেকে গুরু-কা-লঙ্গরের প্রসাদ গ্রহণ (১১-১৫.০০ আর ১৯-২১.০০) এক বিশেষ পুণ্যকর্ম। প্রতিদিন ১০,০০০ যাত্রী সেবার ব্যবস্থা এদের। ভোজনের আগে গুরুনাম স্মরণ স্বাভাবিক প্রথা। এক সন্ধ্যায় ভক্তের দলে ভিড়ে আমরাও সামিল হয়েছিলাম সেই পুণ্য ভোজনে। যতদূর মনে পড়ে বাজরার রুটি, দুরকম ডাল আর সবজিতে পরিতৃপ্ত হয়েছিল আমাদের মন প্রাণ। ভোজনান্তে মন্দিরের কাছেই পেয়েছিলাম যে গরমাগরম দুধ সেই স্বাদ কলকাতায় কখনো পাইনি। প্রসঙ্গত বলে রাখি গুরু কা লঙ্গর আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় লঙ্গরখানা যেখানে প্রতিদিন প্রসাদ নেয় লক্ষাধিক ভক্ত। স্বর্ণমন্দির থেকে উত্তর-পূর্বে সামান্য দূরে ব্রিটিশ বুলেটের ক্ষত নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে জালিয়ানয়ালাবাগের দেওয়াল। ভারতীয়দের কাছে অতি পবিত্র তীর্থ এই জালিয়ানয়ালাবাগ। অভিশপ্ত দিনটা ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। সামরিক আইন রাওলাট অ্যাক্টের অহিংস প্রতিবাদ সভায়

সেদিন এখানে হাজির হয়েছিল কয়েক হাজার নিরস্ত্র ভারতবাসী। কোন রকম সতর্ক বার্তা ছাড়াই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড এডওয়ার্ড হ্যারী ডায়ারের নির্দেশে ব্রিটিশ রাজের সেনারা নির্বিচারে যে গুলি চালায়, তাতে হতাহত হন দেড় সহস্রাধিক ভারতীয়। মৃত্যু সংখ্যা আরো বেশি হতো যদি না সমস্ত সেনার শেষ গুলিটিও সেদিন ফুরিয়ে না যেত। প্রাণ বাঁচাতে মাঠের উত্তর দিকের কূয়োতে ঝাঁপিয়েও মৃত্যু হয় তিন শতাধিক জনতার। স্তম্ভিত হয়ে যায় সমগ্র বিশ্ব! নৃশংস এই হত্যাকান্ডকে ধিক্কার জানায় তামাম জগৎ। বর্বরোচিত এই ঘটনার প্রতিবাদে ব্রিটিশের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেদিন ৮৪ বছর পর সেখানে দাঁড়িয়ে যেন পৌঁছে গেছিলাম ভয়াবহ সেই দিনটাতে। উপস্থিত কোন ভারতীয় ট্যুরিস্ট তাদের চোখের জল আটকে রাখতে পারেনি।

সকালবেলায় জালিয়ানয়ালাবাগ যেমন মন খারাপের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল, বিকেলে আট্টারি ওয়াঘা বর্ডারের ফৌজি প্যারেড তাতে বীররসের প্রলেপ লাগিয়েছিল নিশ্চিত। অমৃতসর থেকে কম বেশি ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে ভারতের আট্টারি আর পাকিস্থানের ওয়াঘায় যে চেকপোস্ট রয়েছে তার মাঝখানে নো ম্যান্সল্যান্ড মাত্রই ফুট পাঁচেকের। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত ফৌজি শৃঙ্খলার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ দুই সীমান্তের মূল বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ প্রতি সন্ধ্যায় ১৮-৪৫ এ যখন দুই চেকপোস্টের গেট খোলে, জাতীয় পতাকা নামে আর দু'দেশের ফৌজি পা তুলে প্যারেড করে- সে এক দেখার মত দৃশ্য। এ যেন দু'দেশের ফৌজির এক প্রতিযোগিতা - কে বেশি উঁচুতে পা তুলতে পারে তার। দুই সীমান্তের গ্যালারির দর্শকের উচ্ছ্বাসে মনে হয় যেন তারাই অদৃশ্য এক লড়াইয়ে জিতে গেছে!

সীমান্ত সফরের স্মৃতি মধুরতর হয়েছিল ফৌজি বন্ধুদের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে। সন্ধ্যা ফুরিয়ে আসে, সেই সঙ্গে চণ্ডীগড়-হিমাচল-অমৃতসরে থাকার সময় সীমাও। পরদিন সকালবেলার অকাল-তখত এক্সপ্রেস, এখন যার নম্বর হয়েছে ১২৩১৮, অমৃতসর থেকে আমাদের পৌঁছে দেবে তারপর দিন বিকেলের কলকাতায়।

অমৃতসর স্বর্ণ মন্দির

সুভাষ চক, ডালহৌসি

ওয়াঘা সীমান্ত

ওয়াঘা সীমান্তে প্যারেড

খাজিয়ার

পথের বিপদ

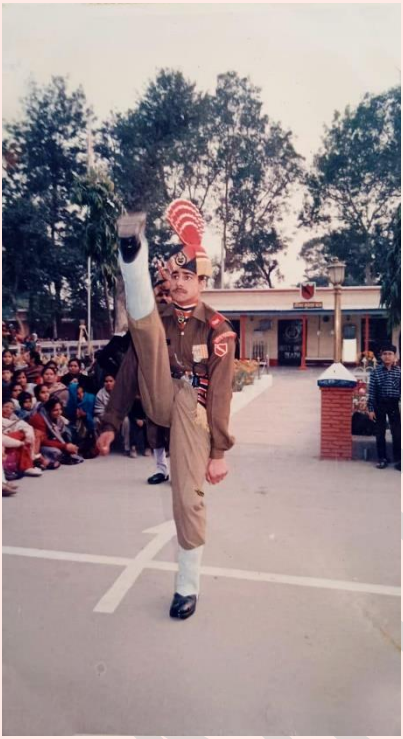

ওয়াঘা সীমান্তে বিটিং রিট্রিট

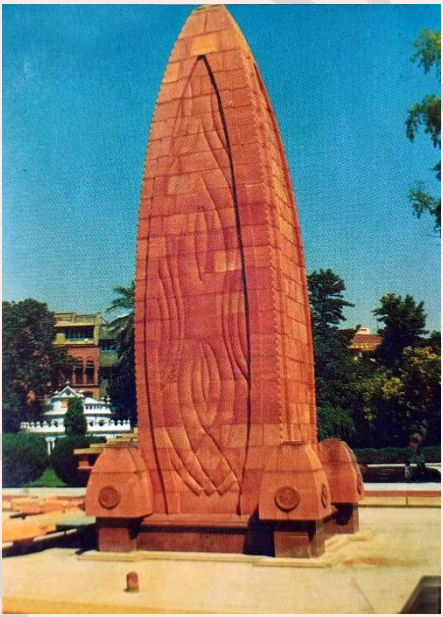

জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদ স্মৃতি

"রাজশক্তির অত্যাচারের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা জাগ্রত হয়।"

--- শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল

আজকের কাব্য

সুনন্দন ঘোষ

কুয়াশায় মাখা সকাল।
মেঘ জমছে আকাশে।
হয়তো বৃষ্টি হবে; শীতের রেশ চলবে আরো ক'টা দিন।
ঋতু যায়, ঋতু আসে।
দিন যায়, দিন আসে।
হাত ছাড়িয়ে চলে যায় যে দিন, সে আর ফিরে আসে না।
যাদের নিয়ে যায়, তারাও ফিরে আসে না।
ঘোলাটে হয় চোখের মণি, শিথিল হয় শরীর।
যারা হারিয়ে গেল তারা থেকে যায় ছবিতে, অভ্যাসে ...

আজকের এই কাব্য আসলে পালিয়ে বেড়ান।
সকাল থেকে রাত অসহায় ভাবে দেখা
সেপটিক ট্যাঙ্কে ধর্ষিতা শিশুর দেহ,
জনারণ্যে তরুণীর ছিন্ন কণ্ঠনালী,
গরম বুলেটে নির্বাক প্রতিবাদী যুবক,
চাকরী চুরির সাফল্যে লুটেরাদের উল্লাস,
ডাক্তার খুনের তদন্তের বাহানায় বিশ্বাসের খুন।

এ কাব্য বর্তমানের কাছে হেরে যেতে যেতে
ফিরে যাওয়া অতীতের দরজায়,
স্বপ্ন নিয়ে ---
একদিন ফিরে আসবো ত্রিশরণের বাঙলায়।

DO NOT COPY